উত্তরঃ ভূমিকা : বাংলা সাহিত্যের প্রথম সার্থক ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৮-৯৪)। বাংলা উপন্যাস মুক্তি পেল বঙ্কিমচন্দ্রের অনবদ্য সৃষ্টি 'কপালকুণ্ডলা' (১৮৬৬) উপন্যাসের মাধ্যমে। রচনাশৈলীর বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যে বিজড়িত হয়ে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে কপালকুণ্ডলা সার্থক উপন্যাস হওয়ার গৌরব অর্জন করেছে। বঙ্কিমচন্দ্রের রচনায় চরিত্রের গঠন একটি উল্লেখযোগ্য বিষয়। আমাদের বর্তমান আলোচনার বিষয় তাঁর 'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাসের গঠন কৌশল।

উপন্যাস মানবজীবনের শিল্পরূপ। আর এ উপন্যাসকে যেভাবে দাঁড় করানো হয় তাই হচ্ছে উপন্যাসের সংগঠন। অন্যভাবে বলা যায়, একটি উপাদানের সাথে আরেকটি উপাদানের সম্পর্কই হচ্ছে সংগঠন। প্রাথমিক পরিকল্পনার ভিত্তিতেই একজন শিল্পী তার শিল্পকর্মকে রূপায়িত করেন। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর 'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাস সংগঠনের ক্ষেত্রেও যথেষ্ট প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন।

'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাসটি চার খণ্ড এবং খণ্ডগুলো মোট একত্রিশটি পরিচ্ছেদে বিভক্ত। খণ্ড বিভাগ করা হয়েছে মূলভাবের পর্যায়গুলোর দিকে লক্ষ রেখে। যেমন– প্রথম খণ্ডে তীর্থযাত্রা, কাষ্ঠারোহণে বনের মধ্যে যাত্রা, নবকুমার ও কপালকুণ্ডলার সাক্ষাৎ, কাপালিকের কবল হতে মুক্তি, অধিকারীর পরামর্শে নবকুমার ও কপালকুণ্ডলার বিবাহ এ হচ্ছে এ খণ্ডের ঘটনাংশ। এ অংশে আমরা ঘটনাবলির প্রস্তাবনা পাই। এ ঘটনাংশের ওপর কপালকুণ্ডলার অবয়ব নির্মিত। দ্বিতীয় খণ্ডে মতিবিবির সাথে নবকুমারের সাক্ষাতের ফলে কাহিনিতে ত্রিভুজ প্রেমের সূচনা হয়েছে। এখানেই মূল কাহিনির সাথে একটি শাখা কাহিনি এসে যুক্ত হয়েছে। এ খণ্ডকে ঘটনার ক্রমবিকাশরূপে চিহ্নিত করা যায়। প্রসঙ্গক্রমে যুক্ত হয়েছে পদ্মাবতীর ধর্মান্তরের কাহিনি এবং স্বামী কর্তৃক পরিত্যক্ত হওয়ার ঘটনা যা পাঠককে পীড়া দেয়।

তৃতীয় খণ্ডে মতিবিবির আগ্রায় যাত্রা সংকল্পে ব্যর্থ হয়ে শেষে নবকুমারকে লাভের আশায় সপ্তগ্রামে প্রত্যাবর্তন এবং নবকুমার ও কপালকুণ্ডলার মধ্যে চিরবিচ্ছেদের আয়োজন প্রভৃতি ঘটনাংশ। চতুর্থ খণ্ডে বর্ণিত হয়েছে নবকুমারকে পাওয়ার জন্য মতিবিবির নানা কার্যকলাপ এবং উপন্যাসের সমাপ্তি ঘটেছে নবকুমার ও কপালকুণ্ডলার অতল সমুদ্রের অতল গহ্বরে আত্মাহুতির মধ্য দিয়ে, এখানেই উপন্যাসের সমাপ্তি ঘটেছে। কাহিনি বিন্যাসের মত বঙ্কিমের উপন্যাসের চরিত্রায়ণ কৌশল তাকে অপরাপর ঔপন্যাসিকদের থেকে পৃথক করেছে। তাঁর 'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাসে চরিত্রায়ণ কৌশলের কতকগুলো বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায়। যেমন–

ক. রূপবহ্নি : রূপের প্রতি আকর্ষণ। এ উপন্যাসের প্রধান প্রধান চরিত্র বা নায়ক নায়িকার জীবনে রূপের মোহ বা রূপের প্রতি আকর্ষণ এত তীব্র যা উপন্যাসের অন্তিম পরিণতিকে ত্বরান্বিত করেছে। কপালকুণ্ডলা উপন্যাসে নবকুমার, কপালকুণ্ডলা ও মতিবিবির মধ্যে যে সংকট সৃষ্টি হয়েছে তার মূলে রয়েছে রূপজমোহ, নবকুমারের রূপজমোহ দ্বিমাত্রিক। প্রথমত, সমুদ্র দেখে বলছে "আহা কি দেখিলাম! জন্ম জন্মান্তরেও ভুলিব না।" (প্রথম খণ্ড প্রথম পরিচ্ছেদ) দ্বিতীয়ত, কপালকুণ্ডলাকে দেখে বলছে, "এ কি দেবী মানুষী না কাপালিকের মায়ামাত্র।" (প্রথম খণ্ড ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ) কপালকুণ্ডলা নবকুমারের রূপে আকৃষ্ট হয়ে তাকে কাপালিকের হাত থেকে রক্ষা করেছে। মতিবিবির মধ্যেও রূপজমোহ তীব্র।

খ. অসূয়া বা ঈর্ষা : মতিবিবির চরিত্রে ঈর্ষা পাওয়া যায়। সে সেলিমের প্রেমিকা মেহেরুন্নেসার প্রতি ঈর্ষান্বিত হয়েছে। আবার কপালকুণ্ডলার প্রতি ঈর্ষান্বিত হয়ে তার সাথে নবকুমারের চির বিচ্ছেদ ঘটানোর সংকল্প করছে। সে নবকুমারকে বলছে "এ জন্মে তোমার আশা ছাড়িব না। তুমি আমারই হইবে।" নবকুমার ও কপালকুণ্ডলা চরিত্রে ঈর্ষাবোধ নেই।

গ. নিয়তি চেতনা : নিয়তি চেতনা বা দৈবলীলা বঙ্কিমচন্দ্রের চরিত্রায়ণের একটি কৌশল। নবকুমার নিয়তির সন্তান। কপালকুণ্ডলার সাথে প্রথম সাক্ষাতেই নবকুমার, "কলের পুত্তলির ন্যায় সঙ্গে চলিলেন।" কপালকুণ্ডলার জীবনে নিয়তির প্রভাব সবচেয়ে বেশি। আকাশে ভৈরবীর মূর্তি দর্শন, বিল্বপত্র পড়ে যাওয়া, স্বপ্ন দেখা, ঘরে ব্রাহ্মণবেশীর চিঠি সবই নিয়তির খেলা। নিয়তির ইশারাই তার জীবনের ট্র্যাজেডিকে ত্বরান্বিত করেছে। মতিবিবির চরিত্রেও নিয়তির প্রভাব আছে। নিয়তির দ্বারা তাড়িত হয়েই তাকে পদ্মাবতী থেকে লুৎফুন্নিসা আবার লুৎফুন্নিসা থেকে মতিবিবি হতে হয়েছে।

ঘ. নাটকীয়তা : বঙ্কিমচন্দ্র যখন কাহিনির মধ্যে পট পরিবর্তন করতে চান তখন নাটকীয়তা অবলম্বন করেন। তিনি দু'ভাবে নাটকীয়তা ব্যবহার করেছেন সংলাপে এবং দ্বন্দ্বসংঘাতে।

সংলাপের মাধ্যমে নাটকীয়তা

"মতিবিবি : মহাশয়ের নাম কি?

নবকুমার : নবকুমার শর্মা।

লেখক : প্রদীপ নিবিয়া গেল।"

ইতিহাস, কল্পনা ও বাস্তবতাবোধ এ তিনটি যখন বিমিশ্রিত রূপ ধারণ করে তখন হয় রোম্যান্স। 'কপালকুণ্ডলা' একটি রোম্যান্স উপন্যাস। রোম্যান্সের উপাদানগুলো এতে পাওয়া যায়। যেমন–

১. ইতিহাস ও কল্পনার মিশ্রণ : এ উপন্যাসের ঐতিহাসিক চরিত্র মতিবিবি, মেহেরুন্নেসা, সেলিম-এর সাথে কাল্পনিক চরিত্র নবকুমার, কপালকুণ্ডলা ও শ্যামাসুন্দরী এমনভাবে মিশ্রিত হয়েছে যে কোনটি ঐতিহাসিক চরিত্র আর কোনটি কাল্পনিক তা পার্থক্য করা যায় না।

২. দৈবশক্তি : দৈবশক্তির অদৃশ্যলীলা 'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাসে দেখা যায়। এ উপন্যাসে নবকুমার ও কপালকুণ্ডলা দু'জনের মধ্যেই দৈবশক্তির প্রভাব আছে। অধিকারীর কাছ থেকে সপ্তগ্রামের পথে যাত্রাকালে দস্যু আকান্ত মতিবিবির সাথে সাক্ষাৎ একটি দৈব ঘটনা ছাড়া আর কী?

৩. রহস্যময় দৃঢ় ব্যক্তিত্বশালী মনুষ্য চরিত্র : বঙ্কিমচন্দ্র 'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাসে রোম্যান্সের অত্যুজ্জ্বলতা সৃষ্টির জন্য 'কাল্পনিক' চরিত্রের অনুপ্রবেশ ঘটিয়েছেন, ঘরের মধ্যে বাঘের ছাল, ফল ভক্ষণ, নরমু- দিয়ে পূজা এবং সমুদ্রতীরে ধ্যান ইত্যাদির মধ্য দিয়ে কাপালিক চরিত্রের দৃঢ়তা ফুটে উঠে। রহস্যময় দৃঢ় ব্যক্তিত্বশালী আরেকটি চরিত্র মতিবিবি। ব্রাহ্মণ বেশ ধারণ ও রাত্রে বনে প্রবেশ তাকে রহস্যময় করেছে।

৪. অতিপ্রাকৃত উপাদান : এ উপন্যাসে অতিপ্রাকৃত উপাদান হিসেবে এসেছে স্বপ্ন, চিঠি, কৌতূহল, সংলাপ, যোগশক্তি, নাটকীয়তা, সন্ন্যাসী, মহাপুরুষ, রাত্রিকালীন ঘটনার সংঘটন ও অতিলৌকিক সংকেত ইত্যাদি। কপালকুণ্ডলায় বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষা ব্যবহার অত্যন্ত সতর্ক, শব্দ নির্বাচন ও প্রয়োগে প্রায় সর্বদা স্বতন্ত্র। শব্দ সম্ভারে সমাসবদ্ধ ও সন্ধিযুক্ত ভারী পদের প্রাচুর্য। যেমন– 'রবিরশ্মিমালা প্রদীপ্ত' 'গগন প্রান্তে গগনমহিত' প্রভৃতি শব্দের ব্যবহার। তার সহজতর শব্দের মিশ্রণ আছে। ঘটনার বিবরণ ও বর্ণনার ভাষা প্রধানত সংস্কৃতানুসারী। প্রথম দর্শনে কাপালিকের ভাষা সম্পূর্ণ সংস্কৃত। যেমন– 'কস্ত্বং' 'তিষ্ঠ' 'মামনুসর'। সংলাপের ভাষা দ্রুতগতি এবং নাট্য তাৎপর্যময়। যেমন–

আমায় কোথায় লইয়া যাইতেছেন?

কাপালিক কহিল– 'পূজার স্থানে'

নবকুমার কহিলেন, "কেন?"

কাপালিক কহিল, 'বধার্থ।'

মোটকথা, বঙ্কিমচন্দ্র চরিত্রানুযায়ী ভাষা ব্যবহার করেছেন এবং সার্থক হয়েছেন। 'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাসে বঙ্কিমের সর্বজ্ঞ দৃষ্টিকোণ ব্যবহৃত হয়েছে। কেন্দ্রীয় চরিত্রের দৃষ্টিকোণ থেকে অধিকাংশ কাহিনি নির্মিত। এ উপন্যাসে লেখক অনুসময় বা Microtime; এবং বিস্তৃত সময় বা Macrotime এ ধরনের সময়ের ব্যবহার করেছেন। নবকুমার ও কপালকুণ্ডলার প্রেম অনুসময়ের এবং ঐতিহাসিক ঘটনা বিস্তৃত সময়ের নির্দেশ করে। একটি উপন্যাসে একই সাথে অনুসময় ও বিস্তৃত সময়ের ব্যবহার খুবই বিস্ময়কর ব্যাপার। এ উপন্যাসের একটি বিশিষ্ট গঠন কৌশল প্রতি পরিচ্ছেদের নামকরণ। যেমন– সাগরসঙ্গমে, বিজনে, উপকূলে ইত্যাদি। লেখক প্রতি পরিচ্ছেদের শুরুতে উদ্ধৃতি ব্যবহার করেছেন কাহিনির সাথে, যার আত্মিক সম্পর্ক আছে। যেমন– "Floating straight obedient to the stream." Comedy of Errors.

উপর্যুক্ত আলোচনা শেষে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে, 'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাসের গঠন কৌশলের ক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্র সার্থক। চরিত্র চিত্রণে, পরিকল্পনায়, ভাষা ব্যবহারে 'কপালকুণ্ডলা' বাংলা সাহিত্যের একটি অবিস্মরণীয় সৃষ্টি।